KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication : 28/2 আর. এন. ঘোষ রোড, কলি-৩০
Collection : KLMLGK	Publisher : তুলসী মুখোপাধ্যায়
Title অনুভব (ANUBHAB)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number গ্রীষ্ম সংকলন শারদ সংকলন Puja Special শারদ সংকলন (Autumn) শারদ সংকলন (Autumn)	Year of Publication : May 1981 1981 1984 1987
	Condition : Brittle Good ✓
Editor তুলসী মুখোপাধ্যায়	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

তুলসী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কবিতা পত্র

শারদ সংকলন ১৩৯৪

With best wishes :

Eastern Belting & Cotton Mills (Pvt) Ltd.

Manufacturers of :
Quality Beltings Hair, Cotton, Elevator, Hose Pipes and Industrial V-Belt

Swan Brand & Swan Swan Super Brand

City Office :
20, Netaji Subhas Road (1st Floor), Calcutta-1

Regd Office & Factory :
G. T. Road, Baidyabati
Dist Hooghly (West Bengal)

Telegraam 'EAST BELT' **Phone : Factory 66-2359**
(Telegraph Office : Baidyabati) **Cal. Office : 22-2729**

With Best Compliments From :

Nistarini Electric Co (P) Ltd.

Manufacturer of :
A.C. Electric Motor Grinder, Polisher, Pumping Set etc.

Sales & City Office :
20, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001
Phone : 26-6259 Gram : Trouble Free (Cal)

Regd. Office & Factory :
75, G. T. Road, Baidyabati, Dt. Hooghly
Phone : 62-1871

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অমিতাভ চৌধুরী

সুখদুঃখের ছড়া

□

দুঃখ বেচার ফিরিওলা বাড়ি বাড়ি ঘোরে
'দুঃখ নেবে, দুঃখ নেবে'—বলে চেঁচায় জোরে।
যা আছে তার মাথার মাচায়
তা'ই দিয়ে যায় বুকের খাঁচায়
বুকটা ওঠে টনটনিয়ে, জ্বলে এবং পোড়ে।
ফিরিওলা বড়ই চতুর
সব বিকিয়ে হলো ফতুর
ভাবে এবার সুখাসনে বসবে পথের মোড়ে।
বসে বসে বড় কষ্ট
সুখ পাছে হয় অল্পে নষ্ট
কিম্বা এসে খাবলা মেরে সব যদি নেয় চোরে!
সুখের পাথর গলেও না
পোড়েও না, জ্বলেও না
দুঃখ বেচার মূলধনে তাই কিনলো মালা গোড়ে।
সেই মালাটা নিয়ে আবার ফিরছে দোরে দোরে॥

কৃষ্ণ ধর

সমর সেন ঃ তাঁর সময়, তাঁর কবিতা

□

কবি সমর সেনের কবিতার সঙ্গে আধুনিক কবিতা পাঠকদের পরিচয় হয়তো ছিল ক্ষীণ। কিংবদন্তীর কবি হিসেবেই ছিল তাঁর বিপুলবিস্তৃত কালাতিক্রমী পরিচিতি। কবিতা রচনা তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন। কবিতা অনুরাগীদের অনুরোধও তিনি দৃঢ়ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর কি কোনো অভিমান ছিল? বাংলা কবিতার জগতে তিনি তো অন্য এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। আমরা জানি না কেন তিনি কবিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

তুখোর ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁর পারঙ্গমতা ছিল প্রবাদ প্রবচনের তুল্য। ঠাকুর্দা দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস রচনার পথপ্রদর্শক। পিতা অরুণচন্দ্র সেন ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। উত্তর কলকাতায় বাগবাজারে বিশ্বকোষ লেনে কেটেছিল তাঁর শৈশব। কোনো ইংরেজি মিডিয়মের আন্টিদের কাছে তাঁর ইংরেজি শিক্ষার পাঠ ছিল না। বাগবাজারের কাশীমবাজার স্কুলের পড়ুয়া। পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেন বেহালায় বাড়ি করে চলে যান। উত্তর কলকাতার সঙ্গে সমর সেনের সম্পর্কে ছেদ পড়ে।

তিনি যখন কবিতা রচনায় হাত দেন তখন আধুনিক বাংলা কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুদের তেজী সময়। তরুণ সমর সেন তাঁর কলমে এমন সব কবিতা লিখতে লাগলেন যা তাঁর পূর্বসূরীদের কারুরই প্রতিধ্বনি ছিল না। তিনি গোড়া থেকেই প্রতিবাদী কবি। প্রতিবাদের ভাষাতেও তিনি আনলেন নূতনত্ব, আধুনিক, মননশীল ও বোধিদীপ্ত এক মানসিকতার ফসল। অথচ প্রতিটি কবিতাই আপাত সারল্যে মনোমুগ্ধকর। আশ্চর্য

এই যে, আরেক মৌলিক কবি জীবনানন্দ দাশও তখন তাঁর কবিতার অন্তঃসমীক্ষায় উজ্জ্বলতা প্রদান করেছেন। তরুণ সমর সেন কিন্তু সেই ডিকশনে আকৃষ্ট হলেন না। সুধীন্দ্রনাথের নিখিল নাস্তির মৌন আবেদনেও তিনি দেননি সাড়া। বিষ্ণু দে'র বৈঠকে তিনি যেতেন। কিন্তু সমর সেনের বৌদ্ধিক চেতনার ধারা তাতে পরিপূর্ণ আপ্লুত হয়নি। তিনি নিজস্ব ধারাতেই কবিতা লিখতেন। তবে সমসাময়িক কোনো কবির সঙ্গে যদি সমর সেনের মনোভঙ্গিমার সাদৃশ্য থাকে তো তিনি বিষ্ণু দে। উর্বশী ও আর্টিমিস-এর পর্ব পার হয়ে বিষ্ণু দে তখন এসে পৌঁছেচেন চোরাবালি'র পর্বে। তরুণ সমর সেনের 'গ্রহণ' ও কয়েকটি কবিতা তখন অনুরাগীদের মুখে মুখে। বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে মধ্যবিত্ত নীরক্ত জীবনকে জর্জরিত করে দেন তাঁরা উভয়েই। বিষ্ণু দে যেখানে স্বভাবসিদ্ধভাবেই তির্যক, সমর সেন চাঁছাছোলা ভাষায় সোজাসুজি এই বিবমিষা দূষিত আবহাওয়াকে ফুৎকারে দেন উড়িয়ে। বিষ্ণু দে'র ভাষায় 'ডলুর মনের ন্যাকামি পাকামি সবই জানি / ডলুর সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজও দিয়েছে ডলুই নিজে।' সমর সেনকে তখন আমরা দেখি একই চেতনাকে অন্যতর ভাষায় রূপ দিতে—'হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও, কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে?'

সমর সেনের নিজের জবানিতে সে সময়কার বাংলার কবিতা আন্দোলনের পরিবেশের রেখাচিত্র মেলে। তিনি লেখেন, বাংলার অতিবুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখন ইয়েটস্, এলিয়ট, পাউণ্ডের প্রচণ্ড প্রভাব, বিশেষ করে এলিয়টের কবিতা ও গদ্য রচনাবলীর। শুদ্ধ কবি হিসেবে ইয়েটসকে খাতির করতেন সুধীনবাবু। আমার বেশি অনুরাগ ছিল এলিয়টের প্রতি। ''Poetry is not a turning loose of emotion' কথাটি এখনো মনে পড়ে বাংলা কবিতা পড়লে।'' (বাবু বৃত্তান্ত)

বাবু বৃত্তান্ত সমর সেনের আত্মজৈবনিক রচনা। খোলামেলা গদ্যে, সাংবাদিকসুলভ নির্মোহভঙ্গিতে তিনি তাঁর স্মৃতি বিস্মৃতির

কিঞ্চিৎ কথা বলেছেন। বাবু, বলা দরকার এক্ষেত্রে দ্ব্যর্থবোধক। সমর সেনের ডাক নাম ছিল বাবু।

আলোচনা থেকে সরে গিয়ে আমি এ প্রসঙ্গে দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠির অংশ উদ্ধার করছি। চিঠির লেখক ছিলেন সমর সেনের পিতার ছাত্র। অধ্যাপক সেনের বাড়িতে চারজন ছাত্র গেছেন পড়া তৈরি করতে। পত্রলেখক লিখছেন : "One afternoon when we four were sorting out the topic to be discussed and Prof. Sen was yet to make his appearance, an extraordinary thin and fair lad in his early teens came out of the adjacent room. stopped for a moment to gauge what we were all about. He carried in his hand a slim paperback booklet. It bore the title Man and Superman. I had tried to delve into that labyrinth several times by then and floundered. I asked the lad his name and he said his name was Babu. He was barely thirteen and was reading in class VII. I asked him, "Khokan can you understand this book ?" He naively replied that there was not much difficulty. Then he quietly slipped away leaving me wondering whether what he said was true. True it was, and that was Samar Sen. Seldom was the promise of the morning so amply fulfilled in the glare of brilliant sunshine.—A. R. Samajdar, Calcutta.

(The Telegraph, 3 September 1987)

সমর সেনের প্রখর ধীশক্তিই সম্ভবত শেষ পর্যন্ত তাঁকে কবিতা থেকে সরিয়ে সাংবাদিক যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণে প্ররোচিত করে। এক সময়ে কবিতায় তিনি বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন 'সবার উপরে আমিই সত্য, তার উপরে নেই।' লিখেছিলেন, কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও লম্পটের পদধ্বনি ?

এ নিয়ে সে সময়ে শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত দাস আধুনিক কবিতার শ্রাদ্ধ করতেন। কিন্তু আমরা জানি ত্রিশের দশকের মন্দা ও চল্লিশের উত্তাল সংক্ষোভের চূড়ায় বসে একজন সচেতন কবির পক্ষে এছাড়া আর কীই বা বলার থাকতে পারে। সমর সেনের কবিতায় ধূসর ও হাহাকার শব্দ দুটির পৌনঃপুনিক ব্যবহারকে অনেক প্রগতিবাদী সমালোচক সে সময়ে কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু তীব্র হতাশাকে শাণিত ভাষায় ব্যক্ত করেই সামাজিক বাস্তবকে তিনি সেদিন নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন :

রাত্রে ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে
আর দিগন্তে জমে ইস্পাতের মতো
ধূসর আকাশ : (একটি প্রেমের কবিতা)

আবার তাঁর কলমেই ঝলসে ওঠে নাৎসিবাদের আগ্রাসী ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ :

মরণ কামড়ে মত্ত শোষকের সর্পক্ষুধা
নিরুদ্দেশ অন্ধকারে কি যাত্রী বসুধা ?
'আজ ২২শে জুন', দেশে দেশে প্রতিধ্বনি শুনি
অখ্যাত অজ্ঞাত আমাদের অনেকে প্রাণ দিল
ছিন্ন ভিন্ন পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন রণক্ষেত্রে,
তারা জয়ী হবে, তাদের মৃত্যুতে জমা হয় নতুন ঐশ্বর্য,
কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, রক্তকরবী ; আমাদের বাহুর বীর্যে
জানি ছিন্ন হবে বৃশ্চিক দিন।
আমার পৃথিবীর মাটি, তাই অমর।
আমাদের সাহায্যে সূর্য আগুন জ্বালে।

(২২ শে জুন)

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কবি সেদিন মানবমুক্তির সংগ্রামে রূপায়িত করেন তাঁর অসামান্য কবিতায়। সেই সমর সেনের অন্যতর দীপ্তি পরবর্তী জীবনে প্রতিভাত হয় দেশে স্বৈরাচার

বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে দুঃসাহসী কলমটির ভূমিকা নিতে। তিনি ১৯৪২ সালেই এ ঘোষণা করেন কবি :

আজ ছিন্ন ভিন্ন প্রাণ পলাশ, রক্তকরবী, অন্ধকার সূর্যের
খনি ধ্বনি প্রতিধ্বনি
হিটলারী বর্গীর নামে ইউরোপের মুখে নামে
করাল ঘৃণার ছায়া
এদিকে ওদিকে হঠাৎ আক্রমণে নরঘাতকের শবদেহ জমে ;
শীত শেষ, ১৯৪২ সালে মহাযোদ্ধা বসন্ত এলো,
এ বসন্ত কাদের ? লক্ষ লাল সৈন্য অগ্রসর
বলিষ্ঠ জয়গানে,
রক্তলোভী রম্য সৈন্য হত হয় অক্লান্ত অভিযানে,
উদয় সূর্যের দেশ প্রাচ্যে ছায়া ফেলে, লড়ে বীর চীনে
নির্মম সঙীনে।
অসংখ্য বর্গীর গোরস্থানে
পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়, লুপ্ত হবে
এ হিন্দুস্তানে,
(খোলা চিঠি)

যে সমর সেন প্রতিবাদী, আপসহীন সাংবাদিক হিসেবে সারা ভারতে শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, যাঁর সম্পাদনায় ফ্রন্টিয়ার পত্রিকাটি দুর্ধর্ষ যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছে গত পঁচিশ বছর তাঁর প্রস্তুতি ছিল কবির তারুণ্য উদ্বেল দিনগুলিতে যখন তিনি কবিতাকেই তাঁর প্রকাশের ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

সমর সেনের কবিত্ব ও তাঁর সাংবাদিকতা একই উৎস থেকে তেজ ও শক্তি আহরণ করত। সে উৎস, বলার অপেক্ষা রাখে না, মানুষ ও তার অপরাজেয় মহিমা।

সদ্য প্রয়াত (আগস্ট, ১৯৮৭) সমর সেনের জন্ম ১৯১৬। বর্তমান রচনাটি তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। সম্পাদক

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রূপান্তর

□

ঘুমের ভেতরে তলিয়ে যেতে যেতে ভয় হয়
যদি এই ঘুম আর না ভাঙে ?
চোখ মেললেই দেখি তোমার চোখের পাতায়
ঘুম নেই, তুমি অনেকক্ষণ বালিশে মাথা রেখে
এপাশ ওপাশ করছ, তারপর ঘুম এলো না দেখে
জানলার দিকে বাইরের অন্ধকারের দিকে
এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক ;
আমার চোখ দুটো নিমিলিত হয়ে আসে,
স্বপ্নের ঘুম পরীরা কি এখন কোথাও
ঘুরে বেড়াচ্ছে ?

শৈশবে অনেক রূপকথার গল্প শুনেছিলাম,
কল্পনার রাজ্যে সে এক সানন্দ ভ্রমণ—
রাজপুত্তুর সর্বদাই জয়ী হয়ে যাচ্ছেন,
দস্যুরা প্রতিহত, তাদের গা থেকে ঝরছে রক্ত
এক নিমেষেই রূপবতী রাজকন্যার উদ্ধার
নিদ্রিত পাষাণপুরী থেকে।

অথচ এই সব রূপকথার গল্প তুমি এখন আর
বলতে চাও না শিশুদের কাছে।
তোমার শৈশব তোমার প্রথম যৌবনকাল তোমার
প্রথম প্রেম
এখন তোমার কাছে রূপকথার মতোই মনে হয়,
তুমি জান আর কখনোই তুমি ফিরে যাবে না
সেই রূপময় জগতে।

এখন আপাতত ঘুমের জন্যে তোমার প্রার্থনা,
খবরের কাগজের পাতা খুলতেও ভয় হয়, কেননা
এক দিনেই
সাতটি বিমান দুর্ঘটনা, চারটি বিমান ছিনতাই,
এক ডজন হাত বোমার বিস্ফোরণ,
স্টোভের আগুনে যুবতী বধূর মৃত্যু—
এসব ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে অহরহ,
এসব ঘটনা জানবার জন্যেই কি প্রতিদিন রাখতে হবে
খবরের কাগজ ?

একি রূপান্তর। তুমি না এক সময় ধ্বনি তুলে
মিছিল ক'রে পার্কের সভায় যেতে !

সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র

কৃষ্ণের প্রতি অর্জুন

□

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধৃবৃন্দ সমবেত, আর কিছু পরে
শুরু হবে মহারণ, কিন্তু এ কি ধর্মযুদ্ধ, যদুপতি ?
তুমি যা বলেছ সবই বুঝি কিন্তু মন যে মানে না,
রক্তের এ হোলিখেলা, মৃত্যু নই—হে অনন্য গতি,
যদি শেষ সত্য হয় তবে কেন চোখে জল ঝরে ?
এবং চূড়ান্ত জয় কেন তৃপ্তি হৃদয়ে আনে না ?

আমি সাধারণ লোক, হিসেব আমার কিছু অন্যরকম,
এখানে সংসার যুদ্ধে অবতীর্ণ রোজই হতে হয়
সেখানে নিত্যই হারি, জেতা ভাগ্যে ঘটে খুবই কম,
অথচ এ পরাজয় কখনোই গ্লানিভরা নয়।

বরং হে শিখিধ্বজ, কি করে যে বোঝাই তোমাকে,
পরাজিত হতে চেয়ে সর্বদাই কি উৎসুক থাকি—
সহস্র দুঃখের চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীর ফাঁকে
উৎসাহে যখন জ্বলে আনন্দিত কালো দু'টি আঁখি ॥

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সাড়া

□

কে এসে এখন ঘুমে-ভরা মাঠ পার হ'য়ে
সাঁকোর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আবার চুল মেলে দিলো।
ঝলমল করছিলো হাই-রাইজের ছায়া জলের ওপরে।
আর চারপাশে আধচোষা আইসক্রিমের গন্ধ, কিছুটা আলাদা
শহর তোমাকে যখন দেখছে, তুমি তখন দেখছো কিভাবে
সব কিছু কাঁপতে কাঁপতে ট্রেনের বগির মতো দূরে চ'লে গেলো
তুমি আগে যাদবপুরের দিকে থাকতে, তা-ই নয় ?
তারপরে ঠিকানা পাল্টিয়ে কোথায় যে চ'লে গেলে
অনেকদিন খবর রাখিনি।
যখন আমরা সেই রক্তে রমণে মেতে
সা-রা-রা-রা করছিলাম আগুনের পাশে,
তুমি কি তখন আমাদের জন্যে
বিশল্যকরণী আনতে গিয়েছিলে ?
শিশির, শিশির, আজ শিশিরে ঝরছে চারপাশে মাঠের স্বরে।
তুমি সাঁকোর স্বরে উঠে আমাদের ডাকছো—
এইবার আমরা সাড়া দেবো ॥

সুব্রত রুদ্র

জন্ম

□

ডাকছো কে আমায় যত্নে ও ভালোবাসায়

মনের মধ্যে যে-সব ঘর বসে আছে
সেই অবহেলার মধ্যে, দেওয়ালগুলোর শেওলায় জীবন
দাও হাত,
অতিথির হাত ধুয়ে মুছে দিই

কদমফুলের করুণগন্ধ হ'য়ে আমি জন্মাই

মনোজ নন্দী

নিজেরই ছায়ায়

□

'আমি ঠিক আমার মতোই·····
অন্য কারো মতো নয়'—
এরকম অভিমানে সে বেশ গর্বিত ছিলো একা
বহুকাল।
আর আজ বিষণ্ণ স্তব্ধতা যেই ঠিক
নষ্ট পুরুষের ঐ শরীর ছুঁয়েছে
তখনই দেখল সে
কখনো কিছুটা বড়ো
কখনো বা ছোট খুব তার নিজেরই ছায়ায়
একা আযৌবন পালিয়ে থেকেছে।

প্রশান্ত রায়

কবিতায় পেয়েছে

□

প্রদোষে কে ভেসে যায় এই ঘাসে

অনায়াসে যার নাম-ধাম জীবন যৌবন
ও কথা লিখবার কথা ছিল—সে কি আর আছে

সে জানলই না এসব শব্দের মানে। মন
ছিল না মানে ও অপমানে, নাকাল সর্বত্র, ইচ্ছে
শুধু দাঁড়াবার।

ব্যাকরণ ছাড়া ভাষা শিখেছে, গ্রামার ছাড়া ইংরাজী
ছন্দ ছাড়া কবিতা লিখেই বাহবা খাজাঞ্চী
দাঁড়াবার বদলে তাড়াচ্ছে দেখি কবিতার মাছি
সঙ্গসুখ ওকে কবিতায় পেয়েছে। ছিঃ
সে জানলই না এসব শব্দের মানে
স্ববিরোধে হাসে

প্রদোষে কে ভেসে যায় ওই ঘাসে

শিশির গুহ-এর কবিতা

এটা কি কবিতা হোল?

□

এখন চারদিকে বুনো বিষফুলের গন্ধ
থমকে যাচ্ছে বাতাস, শুকিয়ে আসছে
বিশল্যকরণী, তাজা রাগী যুবকের হৃদপিণ্ড, এরই মধ্যে
পাহাড়ের ফাঁকে-ফোঁকরে কারা জমা করছে টাটকা বারুদ।

অন্ধকারে বেপরোয়া ঘোড়সোয়ার
বর্শা হাতে খুঁজে ফিরছে মানুষ মারার কারিগরকে
বড় তাড়াতাড়ি মুখোশ পাল্টাছে
শান্তির ঠিকাদারেরা
বাতাসে খবর : আগ্নেয়গিরি ধেয়ে আসছে
পাহাড়ের ফাটল বেয়ে নিচের দিকে।
পোষাক পাল্টানোর দিন শেষ
কেননা আগুন পোষাকের তফাৎ বোঝে না॥

দুঃখের কাছে নতজানু

□

দুঃখের কাছে নতজানু!
দুর্মর পাহাড় ভেঙ্গে যে করেছে পথ
যার জন্য জেগে থাকে কালপুরুষেরা
নক্ষত্র পাহারা দেয় সারারাত
কিসের প্রত্যাশা তার কাছে! কেন নতজানু।

জীবনের কাছে এখনো প্রার্থনা আছে?
যাকে প্রহরে প্রহরে চিরে-খুঁড়ে ছাখো সারাক্ষণ
ত্বকের ভেতর থেকে মাংসের গভীরে, হৃদপিণ্ডে, ধমণীতে
বহমান রক্তের ধারায়—
শোকে-সুখে উদ্বেলিত হয়ে থাক অকালবোধনে
তার কাছে রেখোনা প্রার্থনা॥

দরজার কাছে কার পদ শব্দ, বোধহয় মানুষ
তবে তো বিশ্বাস নিয়ে বাঁচা খুব কষ্টকর নয়
যূথ ভ্রষ্ট হরিণ শিশুর মত কিছুক্ষণ ছোটাছুটি, অন্বেষণ
তারপর ফিরে পাওয়া—
সে ভাবেই দুঃখের শেঁকড় থেকে ওঠ, মূল থেকে গুচ্ছে দাও টান
দুঃখের কাছে নতজানু! কিছুতেই নয়॥

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা

পিকনিক

□

এই আমি ফিরিয়ে নিলাম মুখ আরো একবার
তরল অন্ধকার উঠোনময় শুয়ে পড়লো
জোড়া নারকেল গাছের ফাঁকে ডেকে উঠল
একটি বিষাদময় প্যাঁচা
তারমধ্যে ফিরিয়ে নিলাম মুখ আরো একবার।

চোখের জলের স্বাদ পেতে
আমাকে চোখের জল খুঁজে বেড়াতে হয়নি
অবস্থা বিশেষে চোখের জলের গাঢ়তা
দেখেছি নির্ণয় করে সেখানেও ভেদাভেদ আছে
তবু ফিরে আসতে হয়
আমি কি একাকী যাবো
যাবো না নির্দিষ্ট পিকনিকে একা
তোমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে।

ভীড়ের বাসের মধ্যে কে মাড়ালো পা
তারপর খণ্ডযুদ্ধ
চামড়ার ঠিক নীচে লোমশ দেহটি
গুটি গুটি বের হয়ে আসে।
এসব কি না হলেই নয়
সবাই নাই বা গেল অনেকেই যাবে
অনেকেই গেলে তবে সবুজ পতাকা
নড়ে উঠবে পিকনিক হবে।

আমি যাই

ফিরে আসতে হবে জানি তবু আমি যাই
আমাকে তোমরা ভুল বোঝো, ভাবো ভীতু
তোমরা জানো না আমি
তোমাদেরও নিয়ে যেতে চাই
অনেকেই গেলে তবে ট্রেন ছাড়বে
পিকনিক হবে।

রোদ উঠলে

□

তুমি চাও রোদ উঠলে আমরা যাবো অশোকের বনে
সেখানে সবুজ আছে আমাদের দু-চোখের পাতা
ক্লান্তির সমুদ্র থেকে মুখ তুলে অক্সিজেন নেবে।
যে হৃদয় আমাদের বাক্যহীন সেও বহুদিন
এইবার ভাঁজ খুলে হেঁকে বলবে, 'চলো,
যে কিশোর, আলমের সাথে আর সুশীলের সাথে
আর নীলিমার হাতে হাত দেখা করে আসি।

কিন্তু ভাই রোদ যদি নাই ওঠে অশোকের বনে
তাহলে কি যাওয়া বন্ধ, চাপা পড়া পাথুরে আসনে
যদি ঠোকাঠুকি হয়, যদি সঞ্চারিত হয়ে ওঠে
এক টুকরো হাসি, আর কিছু নাই পাওয়া গেল
আমি খুট্ করে দরজা খুলে বাইরে বেরোবো,
আলমের সাথে আর সুশীলের সাথে আর নীলিমার
কাছে গিয়ে লাল নীল পীতবর্ণ বেলুন ওড়াবো।

শংকর দাশগুপ্তের কবিতা

হিরন্ময় প্রজাপতি ও একজন বোকা

□

হিরন্ময় এক প্রজাপতির কাছে গিয়ে
বোকা লোকটা হাঁটু মুড়ে বসে বলেছিল,
'আমাকে বঞ্চনা শেখাও।'

দু'এক মুহূর্ত পর একটা মুক্তো
প্রজাপতির ডানা থেকে হঠাৎ খসে পড়ল
বোকা লোকটার করতলে,
চমকে উঠল লোকটা, 'একী! এযে মুক্তো!'

সুরভিত ফুলের বাগানে
হিরন্ময় প্রজাপতি হাওয়ার কানে কানে
খিল খিল হেসে বলল, 'বঞ্চনা শিখল না,
আহা বোকারে, ওটা তো ঝুটো মুক্তো!'

ফুলের শবযাত্রা

□

ঝর্ণার কাছাকাছি গিয়ে
আমি চিনতে পারলাম প্রকৃত ঘাতককে,
বৃষ্টির অবিরল পথ চলতে চলতে
আমি দেখতে পেলাম পথের উপত্যকায়
কিভাবে সর্বনাশ লুকিয়ে থাকে।

ফুলের ভিতর লুকিয়ে থাকা সূর্যোদয়,
শিশুর হাসিতে ফুটে ওঠা প্রকৃত পূর্ণিমা,
অথবা চোখের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা পাখির গান,

খুঁজতে খুঁজতে আমি একদিন জানতে পারলাম

ঝর্ণার কাছাকাছি ঘাতক ততক্ষণে
ট্রিগারে আঙুল ছুঁইয়েছে,
শুনতে পেলাম খিলখিল করে হেসে উঠছে সর্বনাশ।

নষ্ট পূর্ণিমার রাতে তখন ফুলের অনন্ত শবযাত্রা

হত্যাকারী

□

অসতর্ক দোয়াত তুমি
উল্টে দিলে মধ্যরাতে,
দিক্ ভুল এক সবুজ স্কুটার
ঠিক লুফে নেয় ভুল প্রপাতে।

পথের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল
নিঝুম হত্যাকারী প্রপাত,
তোমার থেকে ছিনিয়ে নিলো
ক্ষমাহীনের শেষ প্রণিপাত।

স্বপ্নে, জাগরণে

□

স্বপ্নের ভিতর যেদিকে তাকাই
জ্বলে যায়
আমের পল্লব আর নীল অপরাজিতা

জাগরণে যেদিকে তাকাই
ভেসে যায়
সিঁদুরের টিপ আর বেহুলার ভেলা

স্বপ্নের ভিতর, জাগরণে
ছিঁড়ে ফেলে তীক্ষ্ণ নখে কারা

অবেলার তীব্র হোলিখেলা ?

গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতা

এখন হরিহর

□

হরিহরের মাথাটা যে হরিহরেরই, এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারল না হরিহর। ভাবল, সেটা যেন কালচে রঙের এক টুকরো মেঘ হয়ে গেছে। বড় সাহেবের ঘরে ঢোকার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে খানিকটা।

অফিস থেকে বেরিয়ে একদিন সে সম্ভাব্য নানা জায়গায় মাথার খোঁজ করল এবং কোথাও সেটাকে না পেয়ে নদীর কাছাকাছি একটা নির্জন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদল দু'মিনিট। তারপর নিজেরই কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'হরিহর, তোমার মাথাটা গেল কোথায় ?'

শনিবারে তার যাওয়ার কথা ছিল সুদেষ্ণাদের বাড়ি, যাওয়া হয়নি। রাত্রি দশটার সময় সে টের পায়, বড়বাজারের একটা সরু গলির ভেতর দিয়ে সে বাড়ি ফিরছে। তবে কি তার পা দুটোও তার পা নয় ? সে দুটো চলছে কার ইচ্ছেয়, কার হুকুমে ? সে ভাবতে এবং বুঝতে চেষ্টা করল।

মহা ফাঁপড়ে পড়ল হরিহর। রোববার সকালে গোটা কয়েক চড়ুইয়ের কিচির মিচির শোনা তার দীর্ঘকালের অভ্যেস। সেদিন শুনতে পেল না। রাজভবনের পাশ দিয়ে গেল, গুলমোরের গাছটা দেখতে পেল না। আউট্রাম ঘাট থেকে একটা জাহাজের ছেড়ে যাওয়া দেখল, কিন্তু তার ভোঁ শুনল না। দুপুরে একটা কবিতা লেখার পর তার নিজেরই মনে হতে লাগল, সেটা যেন বিজ্ঞাপনের একটা খসড়া হয়ে গেছে। তাহলে সব কবিতাই কী এখন মনোরম বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু নয় ?

দুপুরের পর সে আবিষ্কার করল, তার হাত দুটো তার হাত নয়। তার চোখ দুটো তার চোখ নয়। তার কথাগুলো তার কথা নয়। কোনো কিছুই সে আগের মতো দেখতে কিংবা শুনতে পাচ্ছে না। গুম হয়ে সে বসে রইল রাত ন'টা অবধি, অসাড়।

পরের দিন অফিসে গিয়ে সে বড়সাহেবের ঘরে ঢুকে বলল, 'স্যার, হরিহরকে দেখেছেন?' অফিস থেকে বেরিয়ে এক বাল্যবন্ধুর বাড়ি, বাল্যবন্ধুর বাড়ি থেকে সুদেষ্ণাদের দরজায় কড়া নেড়ে সে জানতে চাইল একই কথা।

সে যেন এক আদিগন্ত খুঁজে দেখা। হরিহরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে হরিহর।

সন্ধ্যায় নিজের বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে সে হাঁকডাক শুরু করে দিল, 'হরিবাবু, ও হরিহরবাবু, বাড়ি আছেন?' তারপর, দরজার ফাঁকে নিজের মা ও বাবাকে দেখে হরিহরের মা ও বাবার মুখটি তার মনে পড়ল। তাঁদেরই লক্ষ্য করে সে বলল, 'ও এখনো তিনি ফেরেননি বুঝি? ফিরবেন, নিশ্চয়ই ফিরবেন। সময় তো হয়ে এল। দরজাটা খুলে দিন, ভেতরের ঘরে গিয়ে বসি। আমার হাতে এখন অঢেল সময়।'

হরিহর এখন হরিহরের জন্যে অপেক্ষা করছে ভেতরের ঘরে। এবং লক্ষ্য করছে, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে তার হাত, পা, কান, মাথা এবং চোখ।

ভয়ের রাজা, ভয়ের যাদুকর

□

একটা ছাইরঙের মানুষ আমাকে ভয় দেখাত রোজ অন্ধকারে। মানুষ না হয়ে সে অন্য কিছুও হতে পারত কিংবা পারে। দেখিনি আমি কাউকেই।

দেখার ইচ্ছে ছিল সেই ভয়ের শরীর। ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না। অন্ধকারে টর্চ জ্বালাতে তখনো আমি শিখিইনি যে।

শিখলুম যখন, ঘোর অমাবস্যায় আতঙ্কিত আমি টর্চের আলোয় দেখলুম, ভয়ের রঙ ছাই না, ও পাড়ার মুখোস-বানিয়ে গোপালের মতো খানিকটা হলুদ ও বাদামি।

অবাক হয়ে আমি বললুম, 'এ কী গোপাল, তুই আমাকে ভয় দেখিয়ে আসছিস সেই সেই ছেলেবেলা থেকে?' যাদুকরের মতো হঠাৎ গোপাল একটা কাকতাড়ুয়া হয়ে বলল, 'না তো, কাকতাড়ুয়ারা কাউকে ভয় দেখায় না।'

টর্চ নেভাতেই গোপাল একটা ছোঁনাচের মুখোস পরে নাচতে লাগল আমার চতুর্দিকের অন্ধকারে।

সেই থেকে দ্বিতীয়বার টর্চ জ্বালাতে আমার ভয়। দ্বিতীয়বার টর্চ জ্বালালেই হয়তো দেখব, বাঁশবেড়িয়ার রাজা সেজে সে কাউকে ফাঁসির এবং কাউকে দ্বীপান্তরে যাওয়ার হুকুম দিচ্ছে।

গোপাল আমার ভয়ের রাজা, ভয়ের যাদুকর।

দাম্পত্য

□

আমার একটা জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি আছে। আর আমার স্ত্রীর একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি।

জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি থেকে আগুন নিয়ে আমার স্ত্রী রান্নাবান্না করেন, সন্ধ্যেবেলার প্রদীপ জ্বালান এবং ছোটখাট সুখদুঃখের দু'চার টুকরো ঝলসে নিয়ে নিজে খান, আমাকেও খেতে দেন।

একেকদিন আমি জ্যান্ত আগ্নেয়গিরির ঝলসানিতে ছটফট করি, এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে কী যেন পাগলের পাগলের মতো খুঁজে বেড়াই। ফিরে এসে দেখি, আমার স্ত্রী ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর রাতের শয্যা পেতেছেন। শয্যার চারপাশে সুগন্ধি ফুলের ও ফলের গাছ। গাছের ডালে জ্যান্ত আগ্নেয়গিরির একেকটা টুকরো ফুল কিংবা ফল হয়ে নক্ষত্রের মতো ঝিকমিক করছে।

সারারাত আমি ভয়ে এইসব ফুল এবং ফলের দিকে তাকিয়ে থাকি। কোনো একটা ফুল কিংবা ফলের টুকরো যদি ছিটকে এসে আমাদের শয্যায় পড়ে, তছনছ হয়ে যাবে আমাদের সংসার, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ঘুম ভাঙবে। এই ভয় আমার কাটতে চায় না কিছুতেই।

সকালে শয্যাত্যাগের আগেই আমি আমার স্ত্রীর কাছে জানতে চাই, 'তুমি কী আমায় ভালোবাসো?' আমার স্ত্রী হাই তুলে বলেন, 'বাসি বলেই তো মনে হয়। এখন আমি তোমাকে ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের কথা ভাবি না।' আমি বলি, 'হুঁ, কাউকে ভালোবাসলে পৃথিবীটা ছোট এবং একা হয়ে যায়, আড়ালে চলে যায় অনেক কিছু, দৃষ্টি ভেতরের দিকে চলে আসে। আমিও এখন তোমাকে ছাড়া অন্য নারীর স্বপ্ন দেখি না।'

হঠাৎ অতিদূর থেকে কথা কওয়ার ভঙ্গিতে আমার স্ত্রী স্বগতোক্তি করেন, 'কেন এমনটা হয় বলো তো?' আমি বলি, 'এই পৃথিবীর কয়েক শো কোটি অতি সাধারণ নারী ও পুরুষের কাছ থেকে আলাদা হয়ে আমরা অসাধারণ হয়ে গিয়েছি যে!'

ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর থেকে রাতের শয্যা গুটোতে গুটোতে আমার স্ত্রী বলেন, 'ঠিকই বলেছ মনে হয়, আমরা আর সাধারণের কেউ নই।' এবং পরক্ষণেই জ্যান্ত আগ্নেয়গিরির গনগনে আঁচে

কয়েক টুকরো সুখদুঃখ সেঁকে নিয়ে বল্লেন, 'এই নাও, তোমার আজকের ব্রেকফাষ্ট।'

সর্দারজী ও আমি এবং এক রমণী

□

সর্দারজী আমাকে বললেন, 'ভালো আইন।'
আইনের যত ধারা, উপধারা আছে, আমি ভাঙতে লাগলুম।

সর্দারজী আমাকে বললেন, 'মাথা নোয়ানো পাপ।'
অমনি পাহাড়চূড়োয় উঠে আমি গান গাইতে
ও আকাশ দেখতে লাগলুম।

সর্দারজী আমাকে বললেন, 'লড়াই চলুক সারাজীবন।'
জীবনভর লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হয়ে আমি ফাঁকা মাঠে
তরবারি ঘোরাতে লাগলুম।

মাঠের এক কোণে এক টুকরো আলোর মতো দাঁড়িয়ে
এক রমণী বললেন, 'লড়াইয়ের বদলে যদি ভালোবাসি?'

কী করব আমি, কী করব? ভেবে না পেয়ে বললুম, যাই,
সর্দারজীর কাছে জেনে আসি, ভালোবাসা কেমন বস্তু।'

আমার মনে হচ্ছিল, ভালোসার বদলে ভালোবাসাও
এক ধরণের লড়াই, যার কৌশল শেখায়নি আমাকে সর্দারজী।

গৌতম গুহ-এর কবিতা

সময়ের রাঙাপথে

□

১. আমি এক আধখানা-প্রেমী
ঠ্যাঙে লেগে পেঁপে ডাল
তবুও ছাড়িনি তাকে
যত অন্ধকার থাক ছোঁয়া চাই
আমার আত্মার আহ্লাদিনীকে

কোনো কিছু মানে নেই দেখে শ্মশানে প্রস্রাবকালে
সত্যি বলি, যথার্থ আনন্দ পাই বহুদিন পর
ঠিক, সে-মুহূর্তে পাটালির মতো চাঁদ আমার গাত্র চেটেছিল
আমিও তাহার
এবং উদিত চন্দ্রাভা চেঁছেপুঁছে যখন যেখানে
জোছনা লেগেছিল

এহেন সুখের কালে কেন রোড এ্যাকসিডেন্টের কথাটা বললে
কেন মনে করে দিলে ঝাউতলা নামে
এক গ্রাম ছিল আমার নিজের

গ্রাম নয় গো—গাঁ, ঝাউতলা গাঁ
সেই গাঁয়ে আমি
জীবনে প্রথম
অতিপূর্ণ
স্তনচন্দ্র
ও তার উদয় দেখেছি

২. তথাপি একথা সত্য ঝাউতলা গাঁয়ে
ঠং করে শব্দ হয় এমন কিছুই

সেদিন ছিল না
ছিলাম আমি,—এই পৃথিবীর
প্রথম দর্শনক্লান্ত বেচারা তরুণ
পালকে ডুবিয়ে হাত
সোনা-গলা সূর্যাস্তের জলে ডুবিয়ে দুই পা
মাথাপিছু সুখগুলো বড় ভালবেসে—

৩. আমাকে ডাকলে কেন
রোড এ্যাকসিডেন্টের কথা ভাল
হঠাৎ এমন কেন মনে হল—

একটি সরল সত্য এইখানে বলি
ঋষিতুল্য হরিতকী বৃক্ষ যদি চেন
অনশ্বর বসুমতী বেঁচে আছে জেনো
সকল যাত্রার শেষে সহৃদয় বান্ধবের গৃহাঙ্গণে এসো

কিন্তু তা-ও না
আজকাল আমি কিছুই বলি না
যারা সব বলে তাহাদের বড়জোর কম্পুটার বলে
বিপিন পালের ভ্রাতাভগ্নী বলে

নক্ষত্র ধ্বংসের পর স্তব্ধ শুভ্র তাজ ভালবাসি
মেরুদ্বীপবাসী পেঙ্গুইন-দম্পতীর কলহ ভালবাসি
আর তোমাকে—আজ
স্তব্ধ তোমাকে—
তুমি কোনো রোড এ্যাকসিডেন্টের মতো নিদারুণ কিছু
বল না যেহেতু

তোমার দু'চোখে স্ফুট জল

তুমি তো তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু
তুমি তো আমাকে দেখছো দেখছো শুধু
সময়ের রাঙাপথে আমাদের ভাঙাগাড়ি একদম
থেমে আছে আজ ঃ

এই তো প্রথম পেয়েছি পৃথিবীর বালক-বয়স
চুপ চুপ ছাখো মাছরাঙা আধভাঙা আলোয়
কেমন তাকিয়ে
সহোদরা তার রোদের বারুদ ঝেড়ে ফেলে
মায়াবী ভ্রাতার ছায়া ছুঁয়ে
পৃথিবীর উঁচুনিচু অন্ধকার সব
উল্টিয়ে পাল্টিয়ে যায়—
গলায় জড়িয়ে হুপু পাখি এবং পাখিনী

দেখে দেখে মনে হয়
আমরাও একদিন যাবো যাবে নাকি ?

অন্ধকারে পারিজাত

□

ডাক শুনি কেন তার মাঝরাতে যখন ঘুমায় মাছ, মরে পড়ে
গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার হিমের মতন অবিরল
বুকের স্তব্ধতা নিয়ে চারিপাশ গা-জুড়োয়
বনের সুবাস মেখে
কেন তার শাদা হাত দেখি, কেন দেখি রক্তিম অধরটুকু তার
মালক্ষ্মী-পূর্ণিমার আলো মেখে বোধ হয়
স্বপ্ন দেখেছে সে প্রীত প্রাণে ;

জাগিয়োনা তাকে সে আরো দেখুক স্বপ্ন ; দেখুক আমাকে
কুড়নো আমের বন ঝাউ গন্ধ নিয়ে আজ সে ঘুমোক
আজ সে ঘুমোক শুধু ; পৃথিবীর সব রাজধানী দূরে রেখে,
দূরে রেখে
করাল সময়
হয়তো সে আজ আমার ; কেন না দেখেছে স্বপ্ন রাজা নয়,
এই রাখাল বালকে
আকাশের নিচে, পাহাড়-দেয়াল প্রতিভাস দূরে থাকে।

সত্য গুহ

এরকমই কথাচিত্র

□

দারুণ বৃষ্টিতে কুমারী জমিখানা ওলোটপালোট করে
ঘরে ফেরার সময় শীত করে কুঁকড়ে যেতে হয়
ধরে আসে গা গায়ের ভেতরকার হাড়
হাড়ের ভেতরকার মজ্জা মজ্জা বরফের সহোদর
ধারা বৃষ্টির সময় ঘরে ফিরতে ফিরতে
সদ্য রোয়া দেয়া চারাগুলোর মাথানাকে বারবার
একশ'বার করে দেখতে সাধ যায়
দেখা আর নিজের থেকে নিজের ভেতর থেকে
একটা কেমন গরম ভাপ ওঠে
তা ঘন বৃষ্টির সময়
গা-গতরে জলবাতাস সুঁচ দাঁতে দাঁত হাড়ে হাড়
এমন ঠকঠকায় যেন বিসর্জনের বাদ্যি
ভিজে গামছায় গা গরমের চেষ্টা

উড়ে ফেরে বিদ্যুতের চাবুক বাজ পড়ে বাবুইয়ের বাসায়
পথ ছিটকে উঠে কপালে
মুশল ধারে বৃষ্টির সময় মনে পড়ে
নড়বড়ে খুঁটির কুড়ে ভিত্তিতে কেঁচো কেঁচোর খোঁজে ব্যাঙ
ব্যাঙের পেছনে সাপ সাপের সঙ্গে চান্দোর বিবাদ
ঘন বৃষ্টির ছাট যখন মারমুখো সাঁওতালের তীরের ফলার মতো
চোখের মণিতে গায়ের প্রতি রোমকূপে বিঁধতে থাকে
শীত রক্ত কথা কয় চোখের মধ্যে ছবি হয় ছবি
প্রধানমন্ত্রী আর তার পরিবারে লোকজন
একখানা কাঁথা তার ওপর আরেকখানা—আরো—আরো
কাঁথার ওপর কাঁথা চাপিয়ে
এই বেলা এই ভরা বাদলার সময়
নুনে-তেলে মচমচে মুড়ি জেড়ে এক একখানা কাঁচালঙ্কা নিয়ে
চিবোচ্ছেন চিবোচ্ছেন আর কেত্তন কচ্ছেন—ইস্
ঘন বৃষ্টির দিনে জমি থেকে ঘরে ফেরার সময়
সুখের চেহারা ভেবে গরম হবার কসরত

শীত করে শীত
হাড়ের ভিতর ঠকঠক মজ্জা বরফের সহোদর
বুকের ভেতরে সেজে বসে থাকে জীবন
ফুটো চাল থেকে জল নামছে ঝর্ণা, থৈ থৈ মেঝের ওপর
ভাতের জন্যে ঘ্যানঘ্যানানির রয়ানী জুড়ে মাষ্টার কৃষি
আর
নির্বিকারে কেঁচো ধরছে সাপ তাড়াচ্ছে
ব্যাঙের ওপর হামলে থাক ব্যাঙের দশা দেখে
মন তাড়াচ্ছে একজন
ঘন বর্ষার দিনে জমিন থেকে ঘরে ফেরার সময়
এইসব, হাঁ, এরকমই কথাচিত্রের ধারা।

আনন্দ ঘোষ হাজরার কবিতা

বানর সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা

□

আসলে বানরদের সম্মান জানানোই উচিত। কারণ তারাই আমাদের ঐতিহ্যসম্মত কুলক্রম ; আমাদের সভ্যতার উৎসস্বরূপ। বানরেরা এখনও আমাদের উপকার করছে নানাভাবে। যদি বলো, আমি কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারি।

আমাদের যতো সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা, শুধু দ্রুতগতিতে জঙ্গলের ভিতরে যাবার জন্য, যাতে বানরের মাংস বহন ক'রে ট্রাকগুলো সিয়েরা লিওন থেকে লাইবেরিয়ার বাজারে যেতে পারে। যাতে আমাজান নদীর ধারে ব্রাজিলের 'উলি' বানর-গুলো, বাদামের দুধের সাথে রান্না হয়ে, বেশ সুস্বাদু হয়ে ওঠে। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন ধরো, মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য, মেডিকেল রিসার্চের প্রয়োজনে প্রতি বছরই কয়েক মিলিয়ন বানরকে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ বা জাপানে চালান করা হচ্ছে, তাদের হাড়ের গুঁড়ো থেকে বানানো হচ্ছে হরেক রকম ওষুধ.....

তারপর মনে করো সেই বড় বড় সভাগুলোর কথা। দশের মঙ্গলের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য যেখানে অনেক কঠিন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যেখানে টেবিলের নীচে হাত পা বাঁধা অবস্থায় ছোট ছোট বাঁদরগুলোকে দেখা যায় না ; কিন্তু টেবিলের ওপরে ফুটো দিয়ে তাদের মাথার খুলিতে আঘাত করে, চামচা দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে তাদের জ্যান্ত ঘিলু খাওয়া হয়। ভেবে দেখো—এরকম সুস্বাদু খাবার না থাকলে বড় বড় সিদ্ধান্ত দেওয়া কি কঠিন কাজই না হতো!

এ সবকিছু করা হচ্ছে সভ্যতার প্রয়োজনে, মানুষের অগ্রগতির প্রয়োজনে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হিতার্থে।

মৃত্যু

□

ঘোরো হে ঘুরে যাও সুপারনোভা তুমি লোহিত দানবের অবশেষ
ভিতরে জড়ো হোক পাহাড় পোড়া ছাই দগ্ধ হিলিয়াম অবলেষ
পচুক পচে যাক ভিতরে প্রাণগুলি ঝরুক চামড়ায় অঙ্গার
ধমনী গন্ধকে হলুদ হয়ে যাক মাটিতে প'ড়ে যাক ভস্ম ;
ঘোরো হে ঘুরে যাও সুপারনোভা তুমি লোহিত দানবের অবশেষ
ধ্বংস অভিষেকে সামিল হবো আজ মৃত্যু বাজাবেন পাখোয়াজ
আমার পিতামহ আমার মাতামহ পিতা ও ভাইবোন জ্ঞাতিকুল
সকলে পুড়ে যায় চর্বি পুড়ে যায় দগ্ধ হয়ে যায় নাভিমূল ;
কোথাও আলো নেই কোথাও ছায়া নেই কোথাও জল নেই শূন্য
কোথাও হাওয়া নেই স্তব্ধ নীরবতা অসীম তমসায় মগ্ন
এই কি অবলীল এই কি স্বাভাবিক এই কি প্রথাদাস মৃত্যু ?
টুকরো হয়ে যাও শূন্যে ভেঙে যাও শূন্যে মিশে যাওয়া বিন্দু।

অনুঘটক

□

অনুঘটকের মতো ওরা সব ব'সে থাকে ব্রহ্মার ডিভানে
রসায়ন শাস্ত্রসম্মত হয়ে মসলাগুলি পাক খায় মিশে যায়
ঘোরে। বন্ধনপ্রক্রিয়া—
একটু জটিল নয় শুধু কমণ্ডলু থেকে একবিন্দু জল।

অনুঘটকের কোনো বিবর্তন নেই
কোনো এক আধুনিক ডারউইন জানে।

আমি পরিবেশনার উমেদার হবো ?

অহল্যা

□

ব্যভিচারে, অভিশাপে, এই দেহ পাথর হয়েছে
তবুও যৌবন—
অঙ্গজুড়ে অশ্রুস্বেদবিন্দুগুলি কঠিন মুক্তোর মত
লগ্ন হয়ে আছে—
ধনু-পরাক্রমে নয়, প্রেমস্পর্শে, প্রেমের কাঙাল
আবার নিষিক্ত বীর্যে ফলবতী হয় যদি হোক
যেমন হলের স্পর্শে পুনরায় জেগে ওঠে মাটি……

তুমি ছোঁও, ছুঁয়ে যাও—
আবার খোঁপায় পরবো বকুল দোপাটি।

ইঁদুর

□

আমরা কেবল গন্ধ চিনি এই ধান, মাঠ, খোঁদলের
পরিচিত বাতাসের এবং মাটির
একদিন তোমরাও এইসব গন্ধ চিনেছিলে।
রোদ্দুরে নরম রোম একদিন তোমাদেরও
উজ্জ্বলতা পেয়েছিল ; তোমার সন্তান—
খুদ, কুঁড়ো, তুষ ঘাস একদিন মুখে মুখে বহন করেছে।

শরীরে অদ্ভুত ঘ্রাণ মেখে এলে আতরের
আর কে চিনবে বলো ? আমাদের হত্যার প্রেরণা
দাঁত ও নখের মধ্যে দ্রুত কেঁপে যায়!

যূথবদ্ধ আমাদের নিকটে এসো না।

ব্রততী বিশ্বাস

বৃষ্টির শব্দে

□

বৃষ্টির শব্দে মনে হয় কেউ দাঁড়িয়ে আছে
মিহি পর্দার আড়ালে
অনড়, নামহীন।
মেঘের মান্দাসে কালো ছায়া ভেসে যায়
বৃষ্টিরেণুর গুঁড়ো ওড়ে শহরের প্রান্তিক জানালায়
আকাশ বজ্রকঠিন, তার প্রসারিত বাহু নেমে আসে
মাঠে, পার্কে অরণ্যের ঘুমধরা প্রহরে
বিদ্যুৎ জ্বলেনি কি জীবনের ম্লান অবসরে?
রোদের ধূলোখেলা মেখে পথ গেছে অন্তহীন
বারিপতনের শব্দ বেদনাগহ্বরে জমে থাকে, গলে যায়।
আমার ছায়ার পাশে দীর্ঘতর এক ছায়া
বৃষ্টির সূক্ষ্মজালে মিশে থাকে।
দ্বিপ্রহর উন্মোচনে সে এসেছে পাশে
টের পাই কাঁধে তার হাত
মুঠিতে বিদায়ী আলোর মায়াজাল
পায়ের সামনে তার প্রলম্বিত ছায়া।

কল্যাণ মিত্র

পাই একেবারে নিজের করে

□

তোমার পায়ের মল
ধীরেসুস্থে নরম করে পা ফেলা
এবং পূর্ণ অবয়ব উপস্থিতি

কেমন যেন পুতুল পুতুল মনে হয়।
মনে হয় তোলা শাড়ীর মতো
তোমাকে তুলে রাখা যায় সযত্নে।
আশঙ্কা হয়—
ঠুনকো জিনিসের মতো
হঠাৎই তুমি ভেঙে যেতে পারো খানখান হয়ে।

বরং তুমি যদি
রেখা-রেবা-মিনুদের মতো
প্রতিনিয়ত থাকো জীবনে-সংগ্রামে,
সন্তানের এবং বেদনা
তোমাকে উপস্থিত করে অমসৃণ ভবিষ্যতে
এবং মিলেমিশে একাকার হয়ে যাও
সংসারে ও মিছিলে,—
তখন অখণ্ড তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাই—
পাই পুরো নিজের গভীরে।

অনিমেষ বসু

বয়স

□

একটা বয়স ছিল

একটা বয়স ছিল, যখন—
চালের মূল্য জানার মতো আগ্রহ ছিল না
নিষেধ মানার মতো মনন ছিল না
নিষেধ ভাঙার মতো যথেষ্ট উৎসাহ ছিল অদৃঢ় কব্জিতে
এবং কিশোরী শরীরে ছিল রহস্যের খোঁজ
কৈশোরক প্রেমে ছিল সবুজের ছোঁয়া

আর একটা বয়স ছিল, যখন—
গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে ছিল তপ্ত রাজনীতি
উজ্জ্বল যোদ্ধার মতো বুকে ছিল অনন্ত সাহস
কফিঘরে গরম কফির সঙ্গে সত্যজিৎ
বিতর্কিত কাম্যু, রঁ্যাঁর শিল্পবোধ,—আর ছিল
রকের আসরে বসে ফিল্মের চটুল গান, মেয়েছেলে গোনা

সুঠাম মুঠোয় ধরা সুচারু বয়স, খোয়া গেছে
চঞ্চল ঝরণার নিচে জলপরী নেই এই প্রোজ্জ্বল সকালে।

জ্যোতিরীশ চক্রবর্তী

তবু যেতে হয়

□

কোনও রকমে দাঁড়াবার জায়গা পেয়ে বাসে বা ট্রামে যেতে হয়,
যাই-অনন্যোপায় হয়ে, যেতে হবে, তবু যেতে হবে, যেতেই হবে,
কারণগুলো শুধুই চলন্ত মেশিনের পিষ্টনের মত, দিনরাত
কত কিছুর কাছে টিকিবাঁধা, দিনরাত যেতে হয়—তবু যেতে হয়।
হে স্মরণ আবাহনের অধীশ্বর, কার কাছে যাই, কেন যাই, তবু
যেতে হয়!

তুলসী মুখোপাধ্যায়ের
অন্নদাস হেঁটে যায়
মর্মভেদী ভল্লের মতো এই উচ্চারণ বাংলা কবিতায়
নিতান্তই অনার্য কিন্তু অনিবার্য সংযোজন।

অনুভব কবিতা প্রকাশনী
২৪/২ আর. এন. দাস রোড
কলকাতা-৩১

রত্নেশ্বর হাজরা

প্রিয় জিনিস

□

পুরোপুরি খোলা দু'টো চোখের উপর দিয়ে
কুচকাওয়াজ করতে করতে
বেরিয়ে যায়
দেখার মতো ছবিগুলো—
পুরোপুরি খোলা দু'টো কানের উপর দিয়ে
থেই-থেই করে নাচতে নাচতে
বেরিয়ে যায়
সবচেয়ে প্রিয় গানগুলো—
আর
প্রিয় খাবারগুলোর চেহারা ক্রমশ
ঝাপসা হয়ে উঠতে থাকে
উঠতে উঠতে
মরা মানুষের ধুলো-জমা ফটো—যেন
আছে অথচ মনেও পড়ে না
ক্বচিৎ কখনো উপলক্ষ ছাড়া
এমনিভাবে—যেতে যেতে
একজন লোকের সব প্রিয় জিনিস
নাগাল পার হতে হতে
উধাও হয়ে যায়—

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

সংলগ্ন

□

পড়ে যাবে যে !
আমরা চিৎকার করে উঠি

কিন্তু জলের ফোঁটাটা
চোখের মধ্যে
ঠিক ঠিক লেগে থাকে।

বয়েস

□

আমাদের সকলের নিষেধ সত্ত্বেও
বাদুড় এল
রাতভর চুষল ফলগুলো
কাঁচা ফলগুলো নষ্ট করে দিয়ে
সে চলে গেছে।

মৃত্যু

□

শুধু একটাই শর্ত
একটাই শর্তে তার কাছে যাওয়া যায়
তার কাছে যেতে হয়

তা হলো :

বেঁচে আছি।

মেঘের শিকড়ে আজ

□

মেঘের শিকড় আজ ব্রহ্মতালু ছুঁয়েছে টিলার
দুয়েক পশলা বৃষ্টি ঝরে গেছে ইতিমধ্যেই
বৃহদায়তন বন খবর রেখেছে তার ; তৃষ্ণা মেটেনি।
এখন তপস্যামগ্ন, বাতাসও নীরব।

মাইলখানেক দূরে ছোট্ট একটি নদী বয়ে গেছে
চুড়িতে জলের দানা, কাত হয়ে আছে তার হাত ;
তার তীরে গুটিকয় মানুষ দাঁড়িয়ে
গুটিকয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ে চড়ে।

অকস্মাৎ মেঘ ডেকে ওঠে, কেঁপে ওঠে শিকড়বাকড়
এইসব মানুষের শিকড়বাকড় কেঁপে ওঠে
মেঘ ও টিলার মধ্যে সম্পর্কের সূত্র কেঁপে ওঠে

সাতবাসি মোরগের ঝুঁটি কেঁপে ওঠে।

সে

□

কে যেন জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসছে
টের পাই। তার পা মোছার গামছা
প্রস্তুত রাখি। যে চেয়ারে অনেক বছর
বসে আছি, তা খালি করে দিই।

কিন্তু, সে এসব কিছুই গ্রহণ না করে
আমাকে ছাখে
এবং আমার শরীর ও কর্ম ছুঁয়ে চলে যায়।

ভাগ করে খাই

□

আমাকে যে একটুও দিলে না!
—এই কথা শুনে
সে মুখের মধ্য হতে
একটি শব্দ বের করে আনে,
যেন কামড়ানো ফল।

আমি সেই এঁটো-শব্দ খাই, আর ভাবি :

আমার জন্যেও একটু রস তুমি রেখেছো ফলের!

রবীন সুরের কবিতা

যেখানে ভালোবাসা

□

পলেস্তারা খসে পড়লে দাঁত বেরকরা কংকালের
ইটগুলো ভয়ংকর চেহারায় উপহাস ছড়াতে চেয়েছে;
নোতুনের গন্ধ রঙ সব ভালো, অপরিচয়ের
ব্যবধান বড় বেশি মনে হয়, না জানা শরীর
যেমন প্রথমদিন বিছানায় পুরোপুরি যথার্থ বাজেনা।

অতীত ভবিষ্য দ্বন্দ্বে বর্তমান নিত্য কাটাকুটি,
সময় দাঁড়িয়ে থাকতে একদম পছন্দ করে না—
সরাসরি এক্ষুনি সে জানতে চায় কোন দিকে যাবো?

আমি এই শর্তাধীন জীবনের ক্রীতদাস প্রথা
মানার বান্দাই নই, যা হবার হবে
ভেসে থাকি খরস্রোতে ভালোবাসা যেখানে পেয়েছি।

ফ্ল্যাশব্যাক

□

বিষণ্ণ বিকেলে আজ দেহকাণ্ডে সারেঙ্গি বাজাবো।
স্নিতকেন্দ্রে স্নায়ু বাঁধা, বেদনার্ত ছড় টেনে টেনে
জীবনের শ্রেষ্ঠতম দুঃখগুলি মায়াবী সুরের ইন্দ্রজালে
স্মরণীয় গান হবে স্বকাল পেরোনো উত্তরণে।

ছেঁড়া গালচে, ভাঙা ঝাড়লণ্ঠনের ঝাপসা আলো,
নর্তকীরা চলে গেছে চলচিত্র পর্দার ছায়ায়।
পরিত্যক্ত ঘুঙুরের শব্দহীন পদচিহ্ন সর্বত্র ছড়ানো,
শূন্য পানপাত্রে রাত, কেউ নেই একলা হাহাকার
চামচিকে বাদুড় ডানা নাচঘর ভূতের আস্তানা;
বিকেল বিষণ্ণ হলে শরীর সারেঙ্গি বেজে বেজে
প্রত্নময় ম ম স্মৃতি মগজের ভি.ডি.ও. ক্যাসেটে।

মতি মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

যেহেতু

□

পৌনপুণিক রবার ঘষে কাগজের
ছাল-চামড়া তুলে যা তুমি চেয়েছিলে
তার নাম 'আত্মপ্রকাশ'
গলার চারপাশে যে কারণে
গভীর হয়ে বসেছে
বকলসের দাগ।

যখন তুমি প্রাণভরে ডাকো তোমার প্রভুকে
অমনি দশদিক থেকে ছুটে আসে
দশটি মোহর
যেহেতু তিনি দশানন
সাহিত্যের সীতা-হরণের যে যাই অপবাদ দিক
কখনো তিনি
ভক্তকে সংহার করেন না।

হাটবারে
□

রাত্রির মাঝখানে এখন দাঁড়িয়ে আছে সাবালক
অন্য দুই প্রান্তে
টাগ অব ওয়ারে যেন অক্ষম
শিশু ও বৃদ্ধেরা।

আড়াই হাজার বছর আগে এমনি মধ্যরাতে
নারী ও সুখ ত্যাগ করে
এক যুবক বেরিয়ে পড়েছিল নির্বাণের খোঁজে
এখন এই ময়ূরকণ্ঠি প্রহরে
নারী ও সুখ পাগল যুবকেরা ছুটে আসছে
দূরদর্শনের যৌন হাটবারে।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

শ্মশানশয্যা
□

বিছানাটা
কখনো কখনো চিতা হয়ে যায়—

তার শরীর থেকে
আগুন জ্বলতে থাকে
তার চুলগুলো
ছাই হয়ে উড়তে থাকে—

আমার একটার পর একটা
দীর্ঘনিঃশ্বাস—

রেলগাড়ি
□

ঘর থেকে বার
দিন থেকে রাত
মাস থেকে ঋতু
ঋতু থেকে বছর
এবং
যাত্রীরা যার যেখানে যাবার
যার যেখানে ফেরবার

মঞ্জুভাষ মিত্র

সহসা ছবি থেমে যায়

□

পথে যেতে যেতে আমি থেমে গেছি
থেমে গেছে আমার অবয়ব নাকমুখচোখ
কানে ভেসে এল সমুদ্রধ্বনির মত সরল সঙ্গীত
চারপাশে বাঁশীর সুরে স্ফীত বাতাস ;
অতঃপর অপুষ্পক ধ্রুবমাধবীর কুঞ্জমূলে বসে আছি
অদৃশ্যপায়ে যে এসে ললাটে চন্দনফোঁটা পড়িয়ে গেল
সে এখনো অপূর্ণ অভিজ্ঞতা। নীল আকাশে
শূন্যতার সাত সহোদরা গান করে

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে দৃষ্টিকোণ প্রসারিত করলাম
কুক্কুরমুখ, নৃত্যচপলা, ধূপবমন সবকিছু ভেদ করে
দেখলাম রৌদ্রবৎ আলো আশা আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়ে
ছুটতে ছুটতে সহসা থেমে আছে অশ্বলেজ-চুল পুতুল
কাঁচের আলমারীতে নাচের ভঙ্গীতে থেমে আছে বালিকাবয়স
থেমে আছে বালকবয়স

ভেবেছিলাম অতিক্রান্ত এইসব চলে গেছে
কিন্তু দেখলাম কিছু যায়নি কিছু যায় না
শুধু সময় ধীরে ধীরে বাঁশীর সুরে স্ফীত হয়
বুকের ভিতর ছুটতে ছুটতে
সহসা ছবি থেমে যায়…

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

নির্বাচন

□

দুপুর গড়ানো বিকেলে সেদিন সবুজ ঘাসের তৈরী
আঙটি পরিয়ে দিয়েছি পায়ের ভুবনমোহিনী আঙুলে
একটু পরেই মিহিআলো চাঁদ আমার আত্মবৈরী
তোমার গলার হারের লকেটে চেপে বসে গেল কী ভুলে !
তারারা ফুটলো হীরে ফুল হয়ে তোমার নাকের ছাবি কি !
তবুও তোমার অপার করুণা সবুজ ঘাসের দাবি কি
এতই বিরাট, আশীর্ব্বাদের মুদ্রায় নিলে আমাকে
আমি কত ছোট যদিও বিশাল তোমার গ্রহণভঙ্গী
ঈশ্বর হবে পরাজিত তবে ? আমি কি এতটা জঙ্গী ?

অথবা তোমার নির্বাচনের এমনি ধারার বিপাকে
আমি চিরকাল জীবনযাপনে তোমার নিত্যসঙ্গী !

নির্মল বসাক

আমার সন্দেহ হয়

□

যখন কারো কাছে যাই অজান্তেই তার কিছু কিছু আমরা গ্রহণ
করে ফেলি
যেমন মায়ের হাতের রান্না বা বাবার কথোপকথনের ধারা
যেমন ছোটবেলায় মাষ্টার মশায়ের মুদ্রাদোষ
চরিত্রদোষ বা গুণ পরস্পরকে প্রভাবিত করেই থাকে করেই থাকে

ছেলেমেয়ের আধো আধো কথাও তো আমরা নকল করি

মুখ ফসকে বেরিয়েও যায় কখনো
সূর্য যেমন পৃথিবীকে টানছে পৃথিবীও তেমনি সূর্যকে

আমার 'প্র'গুলি একটি মেয়ের 'প্র'এর মতো হয়ে যাচ্ছে আজকাল
একি চোরাটান নাকি 'প্র' থেকে প্রেমে পড়ে গেছি মেয়েটার
আমার সন্দেহ হয়

সোফিওর রহমান

কবিতাযুগ

□

নিমগাছের উঁচু ডগ থেকে মোটা ছাল বেয়ে কয়েকফোঁটা শিশির।
রাত্রির কিছু ভুল ছিল—অই তার ঘাম, ভেষজ ওষধির মতো
সকালে তাই আমি ঝিনুকে ধরে একা পান করতেই
নতুন কবিতাযুগ, ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে দাঁড়ালো
মুখোমুখি।
আমি ভারী হয়ে উঠলুম অপরাধবোধে, নিমফুলগুলির সে কি
বিদ্রুপ—
পদ্মবীজে শ্বাসরুদ্ধ শৈতশাসন, পদ্মকারে অপাঙক্তেয় করবে এবার!
পোকামাকড় আর বাতাসের কাঁটায় এতো পবিত্র হরমন!
বিদ্রোহী সংগীত শুরু হ'ল, কারণ আমারও কিছু ভুল ছিল
নাবালক স্মৃতি বলে দেয়নি, 'এখন কবিতাযুগ,···নিমগন্ধের নশ্বর
কবিতা···
প্রতি মুহূর্তে সময় গর্ভবতী, আঙিনার ঘাসে ও বাতাসে
প্রতিবেশীর ক্ষুধা ও জাগরণে কবিতার বীর্য'। দীর্ঘ ধুয়ার মতো
সঙ্গতে জীবন, জীবনের চোখের পাতায় গন্ধ-মধু, স্বর্ণআভা
আকাশের প্রজন্মের ইঙ্গিতধ্বনি—আজ কবিতার দিন, সব
মানুষের দিন।

বুঝলুম, একটু পরে রক্তবালার্ক এসে স্পর্শ করবে এই সময়ের দেহে
সুস্বাস্থে, কোমল জরায়ু ছোঁবে রক্তবীর্য শিশু। বিরহের আহত পদ্ম
আর ছন্দভেজা সব কঙ্কাল এ মাটির বুকে বেঁচে উঠবে, নতুন ধারায়
আমাদের এই সময়ে ; এই জ্ঞানে আমি আজ
কবিতার প্রেমসহ নিমমধু ছোঁয়ালাম আমার শিশুর মুখে।

অমিত মণ্ডল

ভিখিরির স্বপ্নের ছেঁড়া সুতো

□

ঠিকানা বদল করতে করতে এখন ঘাসের ওপর
এই ভালো ;
আদিগন্ত মাঠ চারপাশে
ঘাসের গন্ধ, বুনো আগাছার গন্ধ
বেশ ভালো ;
রঙ করা মানুষের ছায়া এড়িয়ে···
নির্লিপ্ত আকাশের অন্ধকার বুকে আলোর বুটি
শেষরাতে শিশিরের জলে ভিজে ওঠা বুকের লোম
এসবই এখন ভালো।

সে এগুলোকে এখন ভালো‹বাসতে শিখেছে
পেটে হাত দিয়ে ভাবতে শিখেছে
এই বুঝি গরম ভাত এলো
ভাতের গন্ধ··· ···

কৃষ্ণসাধন নন্দী

ঋণ

□

১

চৌহদ্দির ভিতর
আত্মনাম
থাকা না-থাকা সমান।
ঠিক এভাবে আছি
কায়ক্লেশে

অনেক জমা হয়, ভারতবর্ষ, অনেক।

২

যা পেয়েছি
দিতে পারি শোধ ?

খরায় শুকিয়ে বলেছি : নেই
বন্যায় নষ্ট বলেছি : নেই

তুমি মহান
তাই নির্লজ্জের মতো
বার বার দু'হাত।

৩

তোমাকে কথা দিয়েও ভুলেছি
এমন বেল্লিক, বেশরম আমি।
অনেক কিছুর সঙ্গে
একটা ফ্রিজও যৌতুক

খুব ঠাণ্ডা এবং মা-বাবার বাধ্য

তোমার কাছেও—

সমস্ত ঋণ জমে পাহাড় ছুঁয়েছে।

অঞ্জন ঘোষের কবিতা

শালিখ

□

ক্লান্ত শালিখের মতো আমি সারাদিন উড়ি
(যদিও শালিখ কখনো একলা থাকে না)
দল ছুট, সামাজিক নই
খাবারের খোঁজে, আমি সারাদিন উড়ি এবং সন্ধেবেলা
যখন আমাদের প্রজন্মের সব্বাই মিলেমিশে
এক সঙ্গে পরিচিত উপত্যকায়
নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে স্বপ্ন দেখে,
আমি তখন সহজাত প্রবৃত্তি বোধে
আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে
যন্ত্রবৎ, প্রপিতামহের কিম্বা তারও আগের
মোমদানী ধুয়ে-মুছে রাখতে ব্যস্ত

পুড়ে যাচ্ছি, আমি

□

এইখানে আমি
আমার ধুনির সামনে নতজানু হয়ে পুড়ে যাচ্ছি
সকাল-বিকেল দিন-রাত্রি সব—যাচ্ছি
পুড়ে যাচ্ছি যাবতীয় সুখ ও অসুখে
অস্থি-চর্ম-মজ্জা-মেদ ও মাংস
এবং সবাই...
শরীর নির্ভর প্রাণহীন পাথর অবধি, ঘুম
পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়েছি, স্ফিত হয়েছি, তীব্রও—

এই যে গাছ-গাছালি
আমার আগুনে পুড়ে এখন বৃক্ষ—

দেবদাস কুণ্ডুর কবিতা

দাহ

□

পুড়ে যাক আমার এই অস্তি সার মাংস
আগুন তুমি জ্বলতে থাকো অবিরল।
তবু বাতাসের কাছে নতজানু নয়,
যদি পুড়তে পুড়তে ছাই হয় আমার এই বাসাঘর।
নদীতীরে দাঁড়িয়ে তুমি,
নাভিমূল ভাসিয়ে দিও জলে।
নিকানো উঠোন, আর মাটির দেওয়াল
জুড়ে রেখে যাব স্মৃতিগন্ধ শুধু
এমন তো কথা ছিল না।

অনুপাত নয়, অনুরোধ—
এতদিন যা কিছু পুড়িয়েছ তুমি আগুন
আজ বিকল্প কিছু দাও।

প্রকৃতি তুমি

□

তার আসা যাওয়া ছিল বৃক্ষের কাছে
ঝিলরোড ধরে তার ছিল অবিরল হাঁটা।
হাতের মুঠোয় থাকত শামুকভাঙা খোল।
নৌকোয় খোলে সে ভাসিয়ে দিত তার নরম স্বপ্ন।

এক নারীর কাছাকাছি সেই কিশোর বড় হয়ে উঠল।
তার চুলের গন্ধে শামুকের ঘ্রাণ, চোখের তারায়
ঝিলের নীলফুল। আর তার নরম বুকের ভাজে
বৃক্ষের রস।

সেই যুবক এখন নারীর শরীরে শৈশবের
গন্ধ খুঁজে নেয়। নারীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে
পৌঁছে যায় সেই ঝিলরোডে। নৌকোয়
গলুইতে চেপে বসে প্রিয় শৈশব নিয়ে।

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা

এখন একটা ভাবার সময় এসেছে

□

এখন একটা ভাবার সময় এসেছে
আমি কিংবা তুমি, বা
আমাদের মতো আর যারা,
এ শহরের ফুটপাত ধরে পথ হাটে, বা
আমাদের সঙ্গেই চায়ের দোকানে শেয়ারে খবরের কাগজ পড়ে
তারা কি নিছক মিরজাফরের চরিতে অভিনয় করবে, নাকি
বেঁচে থাকার বাগানে একটি গাছ পুতে
তার গোড়ায় জল ঢালবে এক পাত্র হতে—

এখন একটা ভাবার সময় এসেছে……

প্রার্থনা

□

শুধু আমার জন্য প্রার্থনা কোরোনা বেহুলা
শুধু আমার জন্য প্রার্থনা কোরোনা……
এ উদ্যানের অসংখ্য মানবপুত্র, যারা
একদিন তোমার, সততই জীবনের প্রেমিক ছিলো

তারা আজ নীল অরণ্যে মাদক হাওয়ায় চলতে চলতে
কিছু খুঁজে পাওয়ার অছিলায় ডুবতে ডুবতে
অতল অতলান্ত তলে তলিয়ে গেছে—

সেই সব মানবপুত্রেরা ফিরে আসুক
কোন একদিন……কোন একক্ষণে
তোমার প্রার্থনার পথ ধরে

শিবায়ন ঘোষ

বরঞ্চ যুবতীর

□

এখনো দেখিনি কেউ প্রাণহাতে এসে দাঁড়িয়েছেন
ঢেউহীনেও ঢেউ দিচ্ছেন কেউ,
পূর্বদেশ জ্বলে উঠলে, পশ্চিমের জোয়ার থেকে
জলবাহী জাহাজ পাঠাচ্ছেন

এখনো দেখিনি ঠিক তেমন আয়োজন
মুখ্যতম বেলপাতায়, প্রধানতম ধূপে ও ধুনায়
বিরলতম পদ্মপ্রতিভায় তন্ত্রমতে অকালবোধনের
ততো আলো, ততো জোরালো…

ততোক্ষণে এই মূর্তি, পাথরের ;
এই মূর্তি, বরঞ্চ যুবতীর বলাই হবে ভালো ॥

আনন্দ বাগচী

দিনপঞ্জী

□

লাল মরচে ধরা দিগন্তের দিকে আজ দ্রুতগামী অপরাহ্ণ বেলা
আর কিছুক্ষণ পরে কারো কাছে স্মৃতি হয়ে যাবে,
মাঝে মাঝে চমকে দেখা, কারা আছে
এখন নিকটে কারা আছে,
রক্তের হোঁচট লাগা বুকে হাতঘড়ির চাপা শব্দ
ভয়ঙ্কর লাগে,
চড়ুই হাওয়ায় কিছু খড়কুটো উড়ে যাচ্ছে দ্রুত
এই ধুধু বসে থাকা পাতাঝরা বিষণ্ণ টেবিলে
মূকাভিনেতার মত টেলিফোন স্তব্ধ, আর
মাজাভাঙা ফাউন্টেন পেন
অদৃশ্য গল্পের খসড়া
হাতে রইল যাবার সময়ে।
শৈশব যেমন করে রেখে যায় দেওয়ালে পেন্সিল
ভুল বানানের নাম
বাঁকাচোরা ছবি।

হারানো দিনের কথা

সম্পাদনা ও ভূমিকা : ডঃ প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য

১৫০ টাকার বই মাত্র ৭৫ টাকায়

বি. বি. কুণ্ডু এ্যাণ্ড কোং

৮বি / ১, টেমার লেন, কলকাতা-৯

সুনীল বসু

বেলুন

□

একটা লাল বেলুন পেয়ে
খোকার কি আনন্দ
একটা লাল গোলাপ পেয়ে
খোকার মা চেঁচিয়ে ওঠেন
'আঃ কি সুগন্ধ !'

ফুট্‌ফুটে ওই জোছ্‌না দেখে
খোকার বাবা চেঁচিয়ে ওঠেন—
'আলোয় ভরা দিগন্ত
যাই চলো যাই ছাদের ঘরে
চাঁদটা হলে পড়ন্ত !'

খোকার দিদি পড়ছিল কি
'পাচ্ছি না তো, ব্যাকরণের—
কোথায় থাকে কৃদন্ত ।'

'ঐ ইশ্‌টিশানের নামটা হল কেন অমন
মহুলন্দ ?
হয়ত মাদুর বিছিয়ে কেউ মাখছিল তেল
লোকটা ফিচেল
ওহে তোমার কোথায় বাড়ি
গোয়ালন্দ ?'

'তামাক খাচ্ছ ভুড়্‌ক ভুড়্‌ক
হচ্ছে মনে বেজায় সুখ
খাচ্ছ ভালমন্দ
নেই তো কোন দ্বন্দ্ব !'

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

এ বিশাল আর্যাবর্ত

□

ও বারিবাহন, তুমি পশ্চিমের দিকে চলে যাও।

যোধপুর বিকানীর জয়সলমীরের গ্রামবাসী
চেয়ে আছে আকাশের দিকে
গনগনে বালির তাপে পুড়ে যাচ্ছে ঘাস, গাছ, উদ্ভিদের প্রাণ
ওদের বাঁচাও মৃত্যু থেকে।
অভুক্ত সন্তানদের হাত ধরে রাজারাম, মোতিলাল
এ বছর বিধ্বস্ত খরায়
গর্দভের পিঠে তুচ্ছ সংসার চাপিয়ে
গৃহপোষ্য প্রাণীদের মুক্তি দিয়ে নিয়তির হাতে
চলে গেছে
সাচ্চাইমাতার কাছে ওসিয়ায়—
ওরা তো অলস নয়, ফিরে দাও ওদের ফসল।

ও বারিবাহন, এত মিষ্টি জল ঢেলেছ এখানে
উতলধারায় কেন,
ভেসে যায় গরিবের অপলকা সংসার, ডুবে যায়
অবাক ছাগল-গরু, অবোল শিশুটি ;
বাঁধের ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে সুবল, বুধুয়াসহ হাজার মানুষ
আর তাদের মানুষী।
হঠাৎ-ধনীর মতো স্বেচ্ছাচারী হয়েছে তোমার
প্রশ্রয়ে যে-দামোদর, ময়ূরাক্ষী
অবাধ্য অজয়, তুমি ওদের শাসন করো
শান্ত হতে বলো
জলবন্দী মানুষেরা ভাঙা ঘর আবার বাঁধুক।

ও বারিবাহন, তুমি পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে ছুটে যাও
এ বিশাল আর্যাবর্ত একই দেশ
বুধুয়া ও মোতিলাল এক মা'র দুজন সন্তান
তুমি ভুলে গেছ ?
তুমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি
নও ? কেন তবে
সকল তৃষ্ণার জল সমভাবে যোগাতে পারো না ?
টাল খেয়ে পড়ো একধারে
মাতালের মতো ? নাকি
এ তোমার খেলা
বাৎসরিক প্রমোদ উৎসব !

ও বারিবাহন, তুমি অসহ্য নিষ্ঠুর খেলা সংবরণ করো।

With Best Compliments From :

Anco Engineering Industries

38, Bentinck Street
Calcutta-700069

Phone No. 28-0893

পূর্ণেন্দু পত্রী

শুভঙ্করের চিঠি, নন্দিনীকে

□

কোন কোন কবি এক লাইনেই অমর।
আর সে-রকম পংক্তির জন্যে
একজন কবির কাছে পৃথিবী আজন্ম নতজানু।
দ্বিধা থরোথরো একটি কথার চূড়ায়
সাত-সাতটা অমরাবতীর সুখ
এই রকম পংক্তির জন্যে
হিংস্র ব্যাধ, অরণ্য চষে বেড়াই সারাবেলা।
অথচ সবই রয়ে যায় না-পৌঁছনোর দূরত্বে।

কাল যখন অভিমান মাখিয়ে বললে
শুভঙ্কর ! আমি কি পুরনো হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ ?
তখন তো আমার গলায় ঝলসে ওঠার কথা
বাল্মীকির মন্ত্র।
অথচ ক্যাবলাকান্ত আমার উচ্চারণে
মিয়োবো মুড়ির সোঁতা শব্দে
কী প্রবল হয়ে উঠেছিল অক্ষমতা।

কালকের বাজে উত্তরটা
আজ নতুন করে লিখছি।
বলা বাহুল্য, র‍্যাবোর সৌজন্যে।

কেন্দ্রে আছো, তোমাকেই
সৌররশ্মিরেখা আছে ঘিরে।
নন্দিনী পুরনো হলে
পৃথিবী পাবে না শাশ্বতীরে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ছোট মাছ

□

মাৎস্যন্যায় শেখা নেই। ছোট মাছ পছন্দ আমার।
চাঁদা, খলশে, সরপুঁটি,
বাঁশপাতা, মৌরালার
বাটিভরা ঝোল এসে স্বপ্নে একথালা ভাত মাখে।
একটাই ঝামেলা শুধু—কাঁটা।
শ্বাসনালী ছিঁড়ে খুঁড়ে
কি কাণ্ড বাঁধিয়েছিল গত ডিসেম্বরে!
ঝলকে ঝলকে বমি,
জলবমি, ভাতবমি, শেষে রক্তবমি—
শেষমেশ
পালোধি ডাক্তারকে ডেকে দণ্ড দিতে হল।
বউ খুব খ্রিস্টি সেই থেকে।
নিশ্চরিত্র কাটা পোনা খেতে খেতে হেজে যাচ্ছে জিভ।
নিরুপায় স্বপ্নের ভেতর
কাঁটা-বেঁধা গলা থেকে আজকাল হঠাৎ-হঠাৎ
চোখে জল আসা ডাক ওঠে—
ছোট মাছ, আহা ছোট মাছ!

প্রকাশিত হয়েছে
সামসুল হক-এর
বড়োদের নোতুন ছড়ার বই
জ্বলন্ত আফ্রিকা ও অন্যান্য ছড়া
নষ্টচাঁদ প্রকাশনী
১৫ কালী লেন, কলকাতা-২৬

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

তুমি বিশ্বাস করো

□

অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গিয়ে
রহস্য খুঁজেছি
পাইনি

আলোর নিচে জামা খুলে দিয়ে
শরীর দেখেছি
ছুঁইনি

চোখ ফেটে রক্ত ঝরিয়েছি
তবুও বলতে পারিনি—
এসো

ভুল ভাষা ভালবাসতে চেয়ে
মাতৃভাষা রেখেছি বন্ধক
তুমি বিশ্বাস করো

With best wishes from

S U M A N

Cloth Merchant

18, Rabindra Sarani Cal—1

অজিত মৈত্রের কবিতা

মা

□

সারাটা দিন চলে গেল
নানা কাজে,
বিকেলে
হোটেলে ফিরে
মার চিঠি ;
একটা পোষ্টকার্ডে
মা লিখেছে,
তোর জন্যে নারকেল নাড়ু করে রেখেছি
কবে আসবি ?

বাইরে মেঘে ভরা শরতের আকাশ,
আমার দুগাল বেয়ে জল
হোটেলের গা ছুঁয়ে
যে নদীটা চলে গেছে
যদি আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যেত
মিশিয়ে দিতাম
আমার দু'চোখের জল
নদীর জলে,
মা নদীতে জল নিতে এলে
মার দুটি পা ভিজে যেত
আমার চোখের জলে।
মা
তুমি কি আমার আনন্দটা
অত জল থেকে খুঁজে পেতে ?
বুঝতে পারতে

আমার চোখের জল
তোমার দুটি পা জড়িয়ে ধরে
উঠে আসতে চাইছে
তোমার বুকের কাছে ?

মা আমার মা……

এবং মা

□

বৃক্ষের শিকড় বেয়ে
গভীর থেকে গভীরে
নেমে যেতে চাই,
নেমে গেলে পাওয়া যাবে
মার ভালবাসার উৎস ;
বৃক্ষের সুদৃঢ় শাখায়
হাতের স্পর্শ রাখি
অনুভব করি
পিতার সস্নেহ আশ্রয়।
ঠিক আমার মতই আমার পিতা ও মাতা
মাটির গভীরে মিশিয়ে দিয়েছেন
নিজেদের ;

বৃক্ষ, তুমি আমার মাতা
বৃক্ষ, তুমি আমার পিতা ;
তুমি মাটির গভীর থেকে তুলে এনেছ
মাতার স্নেহ,
পিতার আশ্রয়—

ছড়িয়ে দিয়েছ শাখায়
প্রশাখায়।
আমি সব সময়
তোমাকে দেখিনা
যখন দেখি
আমার দু'চোখে
শিশুর পবিত্র বিস্ময়।

কখনো নয়
□

দু মুঠো ভাত
একটু নুন,
দিলেই তোমার
গাইব গুন,
এমন কথা
ভাবলে কেন মহাশয় ?
আমার ধুতি
ফাতরা ফাঁই
তোমার ধুতি
পড়ছি তাই
তাই বলে কি
বলব তুমি সদাশয় ?
কক্ষনো নয়।

আমার পেটে
নাইকো ভাত

মাথার পরে
নাইকো ছাত
তবুও আমি বলব
তুমি মহোদয় ?
তাই কি হয় ?
কক্ষনো নয় !

ছোট্ট বেলায়
হাত পা ছুঁড়ি
বড় হলে যুদ্ধ করি
মরতে হ'লে
মরতে হবে
কিসের ভয় ?
দাবী আমার
কিছুই নাই ?
হিসেবটা ঠিক
বুঝতে চাই
আমার মাথা উঁচু হলে
তোমার চোখে
কিসের ভয় ?

শীর্ণ হাতের
মুষ্টি ছুটি
আকাশ পানে
তুলি যদি
এই ভেবে-কি
বুদ্ধি তোমার হচ্ছে লয় ?

দু-মুঠো ভাত একটু নুন,
দিয়েই তোমার
গাইব গুন
এমন কথা ভাবলে
কেন মহাশয় ?
তাই কি হয় ?
কক্ষনো নয়।

মণীন্দ্র ঘটক

বর্তমান

□

প্রাচীন মেধার কাছে নুয়ে পড়ি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
অথচ অস্পষ্ট বোধ খসখসে চামড়ার মতো
গোপন যন্ত্রণা আনে ভেতরে ভেতরে।
চাঁদে যারা গিয়েছিল তারা কেউ জানে না আবার
কারা যাবে সেই চাঁদে, জানে না ফেরার কথা
ঘাসে ঘাসে যে রকম ফড়িং হারায়
নিজের সহজ দেশ ওড়ার আবেশে।
এসো, তবে ফিরে যাই গালিচার রঙে
মিশে যাই নক্সার আকারে, চেয়ে থাকি,
পুরে দিই আধুনিক মগজ নিচয়ে
ছাইভস্ম কচুপোড়া ধানি লঙ্কার বাগান।

এসকল নিয়ে আলুথালু চুলে বিলি কেটে
আকাশের দিকে থুথু মেরে উত্থান ঘটাই
অধুনা মেধার। অঙ্কুরের পল্লবে দোলা

লাগুক বা না লাগুক কাল তারা রোদ খাবে,
জল খাবে, হাওয়া খাবে, খেয়ে ফেলবে
হয়তো আমাকে একগ্রাসে নির্দয় নিঃশ্বাসে ॥

সমরেন্দ্র ঘোষের কবিতা

বেদে মেয়েরা

□

বেদেদের মেয়েগুলো একদিন লোকালয়ে এসেছিলো,
বেদে এই মেয়েগুলো খালপাড়ে সম্প্রতি বাসা
বেঁধে আছে, দুয়েকবার তাদের বাসাবাড়ি আমি
দেখে এসেছি। কাল-পরশু ওরা ঘর ভেঙে চলে যাবে
তাই সাবধানে আছি, যদিও জানি উপকূলভূমি
থেকে সরে গেলে কোন একজন নতজানু প্রতীক্ষায়
থেকে যাবে—যদি আর কোনদিন বেদেদের মেয়েগুলো
খালপাড়ে বাসা বাঁধে।

হঠাৎ বিকেলে

□

থলি হাতে যেতে যেতে কোন এক হঠাৎ বিকেলে
বিষণ্ণ বাজারে মেঘভাঙা মেরুণ আকাশ থেকে
বক্ষবন্ধনী ছিঁড়ে জলপ্রপাতের মতো নেমে আসে,
তখন বাজার থলি-শুদ্ধ ভেসে যাই, পোড়া মুখগুলো
কোনদিন মাস্তুল দেখেনি, পাশাপাশি হেঁটে এসেছিলো,
যুগলস্তরের নগ্নতাকে ব্রজের রজের মতো
জিহ্বাগ্রে তুলে নেয় নাই—পাঁচবাদামের তোড়ে
সর্বনাশে আজ ভেসে যায়।

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

কাল নয়, আজই

□

নিবে যাবো ? অতই সহজ !
শিরায় বিদ্যুৎ, রক্তে ঝঞ্ঝা
দুহাতে তুলেছি ধরে জ্বলন্ত মশাল
একা যাবো আজ, বেঁধেছি সাহস !
কোথাও ভ্রূকুটি আছে কিনা
পরোয়া করিয়া।
মুছে যাবো ? অতই সহজ !
পায়ে কাটা, পড়ে দীর্ঘ ধারালো ছুরি
তবু পেরোতেই হবে, কাল নয়, আজই
হেরে যাবো ? কখনও কিছুতে না
তোমাদের হাতে ॥

দিতে চাই, নাও

□

যতটুকু দাও
পরম আদরে তুলে নিই
যখন যেভাবে তুমি আসো
বলি থাকো ভালো থাকো
ঘরের ছায়ায় বসো সুখে।

আমার জীবনে কোনো কালো নেই—
যা আছে তা জ্ব'লে
সমস্ত আকাশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ তারা
তোমার দু'চোখে খুব দূর থেকে
আলো ফেলে যায়।

যতটুকু চাও
দিতে চাই পরম আদরে
বলি থাকো ভালো থাকো
তোমার নিজস্ব অনুভবে ॥

গৌতম মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

বলতে পারি কই

□

আছড়ে পড়া নিশ্বাসদানা
একটি দুটি পুঁতি
গুনে গুনে মা বোঝেন,
আমার ঘুম আসে না।
তারপর আলতো উষ্ণতায়
ঘুম আসে একটু একটু করে।

একটু একটু স্পর্শে
আলোর বেলায় জেগে উঠি।
সে আলোয়,
আমি তো বলতে পারি না
ভীষণ করে দগ্ধ হতে পারলাম !

বিস্তৃতিতে

□

এ গভীর দুটি হাত কার ?
যেন পেতে দেওয়া পথ। সব পথই কি হেঁটে যাওয়ার ?
এই হাত, এই পথ অথবা এই বিস্তৃতিতে
টুকিটাকি কিছু বা রাখলে,
স্বপ্নে জেগে যাবে, সে মনুষ্যেতর নয়।

তার চেয়ে ঢের ভালো ঢের ভালো এমন বিশ্বাস,
সবাই সব কিছু ভুললেও

সুদীপ্ত রায়

সময় নেই

□

দরজা খোলাই ছিল, বলেছিল আসবে।
কিন্তু আসে নি। তবু অপেক্ষায় অপেক্ষায় ছিলাম ;
যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, সুন্দরের গরিমা এবং লোভের
পোষাক ছেড়ে আসে।

এভাবেই বয়স বেড়েছে,
তক্তপোষে শুয়ে।
গোপন ইচ্ছা বাসযোগ্য হয়নি,
বাস্তবও হয়নি।

তবে যা ঘটে গেল, সেটা রাগ না অভিমান ?
এখন আর পিছন ফিরে তাকাবার সময় নেই।

ওথেলো হক

সৎকার

□

মনুষ্যকুলে সাড়ে পনেরো আনা পুষিয়ে
কালনাগিনীর জোয়ারে ভেসে এলো মরা গরুটা
তিনজন মুচি ওকে দেখে টেনে তুললো আমার বাড়ির সামনে

সুবোধ বালকের মত ও উঠে এলো
শিং-লেজ-পা সবই আছে
তবুও ও আজ সুবোধ হয়েছে

অল্প বিশ্রামের পর আবার ওকে ভাসানো হলো
বিশ্রামের জন্য মূল্য—
ওর চামড়া.
ষোলো আনা পুষিয়ে গেলো
জোয়ারের জলে আবার ছুটে চলে
এবার হয়ত নিজেই কোথাও আটকাবে
ওর চর্মহীন শরীরটা নেমন্তন্ন করবে
চিল-কাক-শকুনকে
মৃত্যুর পর নিজের সৎকার কর্মের সেখানেই হবে সমাপ্তি।

অরূপরতন ঘোষ

সেই চোখ

□

রাতের অন্ধকারে সেই চোখ—
ভয় পাই আমি।
দিনের বেলায় সেই চোখ—
ভয় পাই আমি।
আমি কিন্তু কিছুতেই,
চোখ দুটির শিকার হব না
যারা রুখে দাঁড়ায়
তাদের মতই হব আমি,
তাদের মতই অজেয়।

রাতের অন্ধকারে শেষবারের মত
জ্বলে উঠল চোখ দুটি—
সেই চোখে

অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর আহ্বান
প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ালাল ছিলাটান করে
অবশেষে সেই চোখ গ্রাস করল সম্পূর্ণ আমাকে।

সমীর মুখোপাধ্যায়

যমুনা তুমি এখন

□

যমুনা, আমি তোমার বুক ছুঁয়ে বলেছিলাম
দেশ বিভাগ কখনই হবে না।
আজ রক্তাক্ত যোনিতে তুমিই কি উদ্বাস্তু শিবিরে ফিরলে ?
একদিন তোমার হাত ধরে বলেছিলাম
আমার উষ্ণ মাটিতে চিরকাল পা রাখতে পারবে।
একতাল মাটির খোঁজে তাই কি তুমি নিরুদ্দেশ ?

তোমার নিটোল পায়ে চোখ রেখে বলেছিলাম
কাটাবনের ভয় আমাদের কোনদিন থাকবে না।
দেবদারুর ছায়া ফেলে কেন বেছে নিলে দগ্ধ যৌবনের ঘ্রাণ ?
তোমার ঘন কালো চুলে যেদিন ঝড় এলো,
উড়ে গেল সভ্যতার বড়াই, এক টুকরো ডুমুরের পাতা—
কার কথা ভেবে সেদিন পাথর হতে চেয়েছিলে ?

With Best Compliments of

Sri Tarun Kumar Bhattacharya
Govt. Contractor

Patra Market
Krishnanagar, Nadia

সুপর্ণ ভদ্র

আহত পাখীর ডাক

□

আমার চোখের জল তোমার পায়ের পাতায়
এসে পড়ুক প্রতিটি বিন্দু,
দুরন্ত খরায় মরে গেছে যাবতীয় প্রিয় স্বপ্ন,
স্মৃতির আনন্দ বেদনা সব ধুয়ে গেছে প্রবল বন্যায়।

দিনান্তে উড়ে যায় মেঘ
সন্ধ্যার আঁধার নেমে এলে চলে যেতে হবে
যাবতীয় ভুলভ্রান্তি নাভিমূলে জমা আছে
কামনার ফুলগুলি
ঝরে গেছে উরুসন্ধিতে নারীর।

আমি চলে গেলে মগ্ন চরাচর,
দুফোঁটা অশ্রু ফেলো বিষাদে, অভিমানে।
নির্জনে, দূরে সরে থেকে
আহত পাখীর ডাক শুনে শুনে পথ চিনে নেবো।

সমর দাস

তিলোত্তমা কলকাতা

□

চোখে অতল স্বপ্ন, বুকে গভীর আশা
ছিলাটান যুবক আমি
খুব বড় স্বাধীনতার মধ্যে দাঁড়াই—
সময় এসে যখন নিয়ে যায়
প্রাপ্তির কাছে—বলে, দূর হটো !

অযোগ্য ! অযোগ্য !
কতো লোক চারদিকে—লোক আর লোক
এরা কারা ? সবাই অযোগ্য ?
কলকাতায় এখন আর যোগ্য যৌবন নেই
স্বপ্নে মিছিল নেই।
শুধুমাত্র আফ্রিকার খরাত্রাণ
কিংবা শান্তি মিছিলে কিছু বা যৌবন ঝিলিক !

কলকাতা, আমার যৌবন নিংড়ে
তিল তিল করে তোমাকে তিলোত্তমা করে যাবো—
সাধ ছিল—বড় সাধ ছিল
অথচ অযোগ্য যৌবনে তা সাধ্য হল না !

অপূর্ব্ব গোস্বামী

কঠিন বাস্তব

□

উপোসী এক বালক শুয়ে আছে রেললাইনে
মানুষের জটলার ছায়া আর উদাসী রোদ্দুর
ঘিরে তার শরীর।
ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে গ্রামীণ সেই সরল বালক
নিশ্চিন্তে শুয়ে।
স্বপ্ন নয়, নয় রক্তহীন আপোষ—
জীবনযাপন আর।

পড়ে আছে নির্ভীক অসহায় ভিখারি বালক
আগোছালো সংসারের বৃন্তচ্যুত একটি জীবন।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

কার জন্য

□

কার জন্য রেখে যাবো প্রসিদ্ধ প্রণাম ?
কোথায় সেই ছিলাটান দেবদারু—
ধরণীর অমল মহিমা ?
কোথায় সেই নিবেদিত পুরাণ-পুরুষ—
সমান্তরাল হাতে
নিরবধি সৃষ্টি ও সংহার ?
কেন তবে রেখে যাবো বিনম্র প্রণাম !

অথচ বুকের ভেতর খুব তাজা জবা ছিল
যুক্ত করে ছিল ব্যাকুল অঞ্জলি
অথচ দীক্ষা ছিল রক্তের গভীরে
আমূল বসতি ছিল নৈবেদ্য স্বরূপ :
তবু কোন সৃষ্টি ও বিনাশের আহ্বান আসেনি
জ্বলেনি বারুদ !
তবে কেন রেখে যাবো পবিত্র প্রণাম ?

চারদিকে কাঁটাঝোপ আগাছা জঞ্জাল
ম্যাজিক ভেলায় চড়ে
খুব উঁচু আকাশে বিজয় ওড়ায়
চারদিকে ছদ্মবেশী চতুর বামন
দৈব মুখোস পরে
দৈববাণী বাতাসে ছড়ায়……

কার জন্যে রেখে যাবো প্রসিদ্ধ প্রণাম ?

: লিখেছেন :

ছড়া—অমিতাভ চৌধুরী

প্রবন্ধ—কৃষ্ণ ধর

কবিতা এবং কবিতাগুচ্ছ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সতীন্দ্রনাথ মৈত্র আনন্দ বাগচী সুনীল বসু শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় পূর্ণেন্দু পত্রী অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক গৌতম গুহ রত্নেশ্বর হাজরা সত্য গুহ রবীন সুর মঞ্জুভাষ মিত্র মঞ্জুষ দাশগুপ্ত মতি মুখোপাধ্যায় নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সজল বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়া মুখোপাধ্যায় আনন্দ ঘোষ হাজরা।

অজিত মৈত্র মনীন্দ্র ঘটক শিশির গুহ সমরেন্দ্র ঘোষ নির্মল বসাক ব্রততী বিশ্বাস জ্যোতিরীশ চক্রবর্তী।

প্রশান্ত রায় সুব্রত রুদ্র মনোজ নন্দী সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় সোফিওর রহমান কৃষ্ণসাধন নন্দী সমীর মুখোপাধ্যায়।

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় কল্যাণ মিত্র দেবদাস কুণ্ডু তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় শিবায়ন ঘোষ অসিত মণ্ডল অঞ্জন ঘোষ অনিমেষ বসু সমর দাস।

শংকর দাশগুপ্ত সুদীপ্ত রায়, সুপর্ণ ভদ্র অপূর্ব গোস্বামী গৌতম মুখোপাধ্যায় ওথেলো হক অরূপরতন ঘোষ ও তুলসী মুখোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদ : শংকর দাশগুপ্ত

তুলসী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও ২৪/২, আর. এন. দাস রোড, কলকাতা-৩১ থেকে প্রকাশিত এবং তরুণ প্রিন্টার্স, ২৯ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।